



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 382 - 393

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের ‘জল দাও’ এবং ‘স্বয়ং নায়ক’ উপন্যাস : কাহিনির নিরিখে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকের নিবিড় পাঠ

অশোককুমার রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কটন বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: royashok2018@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Novel,
Character,
Freud,
Psychoanalysis,
Dialogue.

Abstract

Santosh Kumar Ghosh is a prominent and exceptional name in the world of Bengali literature. His novels offer readers a new perspective on life and explore various aspects of the human psyche. He has attempted to make his works engaging by incorporating diverse elements, particularly the psychological aspects of his characters. The novels ‘Jal Dao’ and ‘Swayan Nayak’ showcase the multiple facets of human personality, as portrayed by the author. ‘Jal Dao’ revolves around a death reported in a newspaper, exploring the gradual progression towards death and the events and characters responsible for it. ‘Swayan Nayak’ focuses on a central character, delving into their thoughts and emotions, demonstrating the author’s artistic skill. The author has successfully depicted the psychological aspects of his characters, reflecting the influence of Freudian psychoanalysis. The dialogue of the characters often reveals the author’s personal perspective. This paper attempts to analyze how the author has portrayed the psychological aspects of his characters in these two novels.

Discussion

গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতে বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে মূল উৎস হিসেবে আকর গ্রন্থ এবং গৌণ উৎস রূপে সহায়ক গ্রন্থরাজির সাহায্য নেওয়া হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা, ও বিষয়ভিত্তিক সহায়ক বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ফলে যাবতীয় তথ্য সমূহের সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পত্রটিতে একটি নিটোল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতিগতভাবে প্রচেষ্টা থাকবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য : বাংলা সাহিত্যের আসরে উপন্যাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই দুটি উপন্যাস নিয়ে নতুন রূপে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসটির তেমন কোনো আলোচনা নেই। তাই আমাদের নির্বাচিত উপন্যাস দুটিতে এই অনুষ্ঠান নিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা থাকবে। ফলে একদিকে যেমন লেখকের স্বতন্ত্র দিকটির প্রতিফলন ঘটে অন্যদিকে উপন্যাস দুটিতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বিশ্লেষণে বিশেষ তাৎপর্যের দাবী রাখে।

ভূমিকা : উপন্যাস কেবলমাত্র একটি আবেগের বিস্ফোরণে সীমাবদ্ধ নয়, তা জীবনের বহুমাত্রিক রূপায়ণে সমৃদ্ধ। উপন্যাস মানুষের পরিপূর্ণ সমাজজীবনের অন্যতম শৈল্পিক প্রকাশ। সেখানে সমাজ ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও ফুটে উঠে লেখকের সুচারু দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। এই বিশেষ নিবন্ধটি অলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা এখানে মানব মনের তিনটি স্তরের কথা তুলে ধরে পর্যালোচনা করব। তাই অস্ট্রিয়ার বিশিষ্ট মায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে প্রথম মানুষের মন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি দেখেন যে মানুষের মন তিনটি স্তরে বিভক্ত যথা- (ক) **চেতন স্তর** (Conseious Mind) হল মানব মনের প্রথম স্তর যা আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এবং এর প্রতিটি ইচ্ছা, ধারণা, চিন্তাভাবনার সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত বা সচেতন থাকি। চেতন স্তরের পরবর্তী স্তরটি হল (খ) **প্রাক-চেতন স্তর** (Preconscious Mind) যার আয়তন খুবই সামান্য আমরা বহু ঘটনা সময়ের সঙ্গে ভুলে যায় তা আসলে আমাদের মনের প্রাক-চেতন স্তরে চলে যায়। সেই সব স্মৃতি বা ঘটনা চেতন স্তরে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। ফ্রয়েডের মতে মনের শেষতম স্তরটি হল (গ) **অবচেতন স্তর** (Unconscious Mind) এর আয়তন অন্য দুটি স্তরের চেয়ে দ্বিগুণ। স্তরটির আয়তন আরো পরিষ্কার করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ একটি উদাহরণ দিয়েছেন— সমুদ্রের ভাসমান হিমবাহের কিছু অংশই জলের উপরে এবং বাকি অংশ জলে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। ভাসমান স্তরটিকে ফ্রয়েড মনের চেতন স্তর এবং নিমজ্জিত অংশটি মনের অবচেতন স্তর আখ্যা দেন। এটি ব্যক্তির অতীত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। যা আমাদের সভ্য সমাজে অনুচিত এবং বাধা সৃষ্টি করে সেই সমস্ত ইচ্ছে গুলি ব্যক্তির অবচেতন স্তরে জমা হতে থাকে। এবং সেই অবদমিত ইচ্ছাগুলি ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে বা নানাবিধ বিকৃতি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করে। আমরা সব সময় এই অবচেতন মনের ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকলেও অনেক সময় আমাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনের এই তিনটি স্তরের উৎস শক্তি হিসেবে ইদম (Id), অহম (Ego), অধিশান্তা (Super ego) কথা বলেন। ইদম সব সময় অবদমিত ইচ্ছা পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে আর অধিশান্তা সামাজিক ন্যায়-নীতি মেনে অহমকে সচেতন করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই বিষয়টি যখন সাহিত্যের বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সাহিত্যের পথকে আরো নতুন ও প্রশস্ত করে তোলে যা এক অভিনব সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি সৃষ্টি করে যেটি সাইকো অ্যানালিটিক্যাল ক্রিটিসিজম বা মনঃসমীক্ষণ সমালোচনা পদ্ধতি নামে পরিচিত। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বটি মানব সমাজের সাথে সাথে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আলোড়ন তোলে এবং এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ফ্রয়েড শুধুমাত্র তত্ত্বের আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকেননি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন। সোফোক্লিস-এর ‘ইডিপাস’ নাটকের অবলম্বনে তিনি ‘ইডিপাস কমপ্লেক্স’-এর ধারণা তৈরি করেন। যা সাহিত্যের দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী কালে হয়ে উঠে সাহিত্যের চরিত্র বিচারের পরিভাষা। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রধান দুটি আকর গ্রন্থ হল ‘The Interpretation of Dreams’ (১৯০০ খ্রীস্টাব্দ) এবং ‘The Psychopathology of Everyday’ (১৯০১ খ্রীস্টাব্দ)। ফ্রয়েডের এই মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটি একটি যুগান্তর আবিষ্কার। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বহু আধুনিক সাহিত্যিক এই তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন তাঁদের রচনায়। জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, মাতি নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ। এই বিশেষ দিকটি লেখক শিল্পী নৈপুণ্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে খুব সহজেই তাঁর বর্ণনার সাথে একাত্ম করে তোলেন। চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার সঙ্গে বর্তমান সমাজের বহু মানুষের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ অনুসন্ধান করাই এই আলোচনার মূল বিষয়।

বিশ্লেষণ এক : জলদাও – উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা গিয়েছে উপবিভাগ ‘ক’ অংশ এনে উপন্যাসটি শুরু হয়। একটি খবরের শিরোনাম দিয়ে। শিরোনামটি ছিল “পিপাসায় এক ব্যক্তির মৃত্যু”। মৃত ব্যক্তির ছবি শনাক্ত করতে পারেনি বলেই খবরের কাগজে ছবি ছাপানো হয়। প্রথম এই ছবি দেখেন পাদরি পবিত্র বিশ্বাস। যে ব্যক্তি একদিন তার কাছে একগ্লাস জল চেয়েছিল। জল এনে দিয়েও সে খেতে পারেনি। গলায় ঘা ছিল। একটু সময় বসেও গিয়েছে। কারণ বাইরে ‘ঠা-ঠা রোদ্দুর’ ছিল তাই। এক সময় হঠাৎ বলে উঠেছে - “আমার একটা স্বীকারোক্তি শুনবেন?” সে স্বীকারোক্তি করে

নিজে হালকা হতে চায়। স্বীকারোক্তি তাকেই করা উচিত যে তোমার খুব বিশ্বাসী। সেদিন পাদরি সাহেব তার স্বীকারোক্তি শোনেননি। একটু পরে সে কল্পনায় ভেবে নিলেন সেই শবদেহটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই ছবি দেখে পাদরি সাহেবের মনে হয়েছে তিমিরকুমার পিপাসায় মরেনি।

‘খ’ অংশে সেই মৃত ছবিটি দেখেন পরের জন ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং কোম্পানির সেক্রেটারি এ-জে-রে। যে অফিসে সে কাজ করত সেই অফিসের সেক্রেটারি। এই অফিস থেকে তিমির চাকলাদার হাজার বারো শোর মতো টাকা নিয়ে পালিয়েছে। তাই তারা আগের থেকে লালবাজারে ডায়েরি করেছে। সেক্রেটারির কথা থেকে তিমির চাকলাদারের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা পাই। কাজে কর্মে খুব ভাল ছিল। মাস কতক আগে মাথার ছিট হয়েছে। ছিট ধরার আগে পলিটিক্সে যোগ দিয়েছে। জলের প্রতি আগের থেকে আতঙ্ক ছিল।

‘গ’ অংশে রীতা সিং সেই ছবিটা দেখে। রীতার কাছে এসেছে তার পুরনো ছবি ফিরিয়ে দিতে। যে রীতাকে তিমির একসময় ভালবাসত। আজ সেই রীতা তাকে চিনতে পারেনি। তাই তাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়।

‘ঘ’ অংশে ছবিটি দেখে নার্স স্বাতী সেন। এই স্বাতীর কাছে তিমির গিয়েছে ক্লান্ত থেকে মুক্তি পেতে। স্বাতীর কোলে মাথা রেখে একটু আশ্রয় পেতে। স্বাতী নিজেও ভীষণ কান্ত ছিল। স্বাতীকে তিমির বলতে গিয়েছে ‘সর্বত মৃত একটি লোকের গল্প’। এই লোকটি সে নিজেই ছিল পাঠককেরা তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। অল্প সময় রেখে স্বাতী তিমিরকে সরিয়ে দিয়েছে।

‘ঙ’ অংশে ছবিটি দেখেছিল থানার ওসি নটবর সাহা। কিছুদিন আগে তিমির নিজেই গিয়েছে স্বীকারোক্তি করতে যে সে খুনি। দারগাবাবু বুঝতে পেরেছেন তার মাথা ছিট তাই আর বেশি কথা না বাড়িয়ে অন্য কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

‘চ’ অংশে এসে ছবিটি দেখেন সাপ্তাহিক ‘মরমী’ পত্রিকার সম্পাদক মুগাঙ্কমোহন। তার কাছে তিমির কিছু লেখা নিয়ে এসেছে। এই লেখার বিষয় ছিল খুন। সে খাতাটি ফেলে রেখে গিয়েছে। সম্পাদকের মতে যশের পিপাসা তাকে অধিকার করে বসেছিল সেই লোকটি পিপাসার জন্য অনেক দূরে গিয়ে মরল। তাই সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে—

“নানা সুরের চর্চায় বাংলা উপন্যাস বিচিত্রমুখী হয়ে উঠেছে।... বাংলা উপন্যাসে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে।”^২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপন্যাসে দেখা গিয়েছে ‘ক’ অংশে ‘তার ডায়েরি’ উপশিরোনাম নামে প্রকাশ করেছেন। এখানে তার ডায়েরি বলতে শ্রীতিমিরকুমার চাকলাদারের কথা বলা হয়েছে। তার ডায়েরি থেকে তার পরিচয় জানা যায় মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী ছিল। নিজে খুন করেছে এই দিকটি উপস্থাপন করেছে। জুয়ায় বসে এই ঘটনা হয়েছে সে মনে করে। সেই হারের ফলে মদ খেয়েছিল। তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের মতো “কেন আফিং খাইলাম” এই প্রশ্ন তাকে বিদ্ধ করেছিল। সেদিন রাতে আসার সময় সাপ্তাহিকের সঙ্গ নিয়েছে তিমির। পরে সে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের মতো উপলব্ধি করতে পেরেছে “আমাকে নাকে সুতো বেঁধে সমুখ পানে টানছিল, তার নাম নিয়তি।”^৩ এই খুন করার মনোবৃত্তি কবে থেকে এসেছে সে বিষয়ে কয়েকটা স্মৃতির কথা তিনি ভুলে ধরেছে। মিনি নামে এক মেয়ের কাহিনি বলেছে সে। যেখানে প্রেমের কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে দু’জনের মধ্যে। হেডমাস্টার দু’জনকে ধরে ফেলে তাই মিনিকে মাসি বা পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্লাসে পরীক্ষা গোপনে দিয়েও তিমির বন্ধুদের প্রশ্নের সন্মুখীন হয়েছে। সে স্কুলের বোর্ডে একা বুলেছিল। সেই নাম দেখে তিমিরের মনে হয়েছে মালোবউ যেভাবে পুকুরঘাটে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করার পর লম্বমান হয়ে বুলে মরেছে, সেরকম নিজেকে মনে হয়েছে। নামটা তার কাছে শরীর মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে— “নৈতিক বিচার অপেক্ষায় তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই ইহাতে প্রধান লক্ষ্য”^৪ ‘খ’ অংশে ছিল শহর কলকাতার বর্ণনা। আর স্বাতীর কথা এই ডায়েরির পাতায়। ডায়েরির ‘গ’ অংশ থেকে ‘ঝ’ অংশ পর্যন্ত ছিল রীতার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার বর্ণনা। আর ছিল তার বেকার জীবনের বর্ণনা। তাই এখানে রীতার আত্ম-অনুশোচনা শুনতে দেখা গিয়েছে—

“যা আছে, সব খুলে নিতে পারো তিমির, শিউরে উঠব না, আমার আর কিছু যায় আসে না। নগ্ন হয়ে আছি আগে থেকেই। আশা, বিশ্বাস, মূল্য, মর্যাদা, সব তুমি কেড়ে নিয়েছ যে। আমাকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছ। আমার নতুন করে খোয়াবার কিছু নেই।”^৫

ডায়েরির শেষ অংশ তিন। যেখানে একটি ছোট স্বীকারোক্তি রয়েছে আর রয়েছে একটি প্রার্থনা অংশ। এই অংশে তিমিরের যে মন মানসিকতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে আধুনিক মানব মনের প্রতিটি মানুষের ভাবনার আধার হয়ে দেখা দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে— “তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।”^৬ তাই শেষ অংশে তিমির যে কথাটি বলেছে যা পাঠকে ভাবিত করে তুলে।

“আমাদের ট্রাজেডি কি এই যে, কীভাবে বাঁচা উচিত, শিখতে শিখতেই একটা জীবন যায়, শেখা বিদ্যা কাজে লাগাব যে হয়, এমন আর-একটা নির্ভুল জীবনে বাঁচা আর হয় না।”^৭

দুই : স্বয়ং নায়ক - প্রথমেই উপন্যাসটি শুরু হয় আদেশমূলক বাক্যের মধ্যে দিয়ে। কিছু নাট্যশিল্পী নাট্যকারের কাছে গিয়েছেন নাট্যকারের নতুন লেখা শোনার জন্য। কারণ হিসাবে তারা জানিয়ে তাদের আর সময়ের সাথে চলা হচ্ছে না বলেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাব খাইয়ে চলতে পারছে না। এর কারণ নাট্যকার নিজেই। কারণ একের পর এক নাটক নাট্যকারের মার খেতে থাকে। আর তার খেসারত দিতে হয় নাট্যশিল্পীদের। নিজেদের তারা ‘গেঁতো জম্বুর’ সঙ্গে তুলনা করেছে। তবুও নিরুপায় হয়ে ওরা নাট্যকারকেই আকরে ধরে পরে আছে। লোক নিক বা না নিক ওরা নাট্যকারের পাশে আছে। ওরা মনে মনে পণ করেছে ‘হয় বাঁচব, নয় মরব’ এই কথাকে সামনে রেখে। একদিন ‘নট-নক্ষত্র’ নামে যিনি সমাজে পরিচিত ছিলেন আজ সেই প্রভঞ্জন হতদ্যুতি ও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে রয়েছে। এর জন্য দায়ি নাট্যকার। যিনি রাজকুমারী সাজে মঞ্চের সবাত্রে ছিলেন। সেই মধুসূদন মিত্র স্নান হয়ে পড়েছে নাট্য শিল্পী হিসাবে। নাট্যকার তাজা কিছু লিখতে ব্যর্থ বলে সব নাটকের কুশিলব আজ স্নান হয়ে পড়েছে। সবাইকে পাট দেওয়া থেকেও বঞ্চিত করেছেন। কিছু দিন আগে তারা দেখেছেন নাটকের চরিত্র এক থেকে দু’জন ছিল। যারা জ্যান্ত বা রক্তমাংসে হয়ে উঠতে সফল হয়নি। এই আবেদনগুলি শুধু কুশিলবদের নয় এই আবেদন আড়ালে থাকা মানুষদেরও যারা উইংস এর আড়ালে রয়েছে। এমন কী এই আবেদন দর্শকদের। তারা চান ‘জমজমাটি আর মিষ্টি’ গল্প। এর পরেই স্বয়ং নাট্যকারের প্রবেশ। সমালোচকের কথা বলা যেতে পারে—

“‘স্বয়ং নায়ক’ উপন্যাস লিখতে গিয়ে ঘটনাগত আত্মজৈবনিক উপাদান প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট মাত্রায় ব্যবহৃত হল: নামকরণের ‘স্বয়ং’ শব্দটি যথার্থই।”^৮

নাট্যকার যে গল্প ভেবেছেন সেই গল্প তুলে ধরেছেন একের পর এক। যেমন— এক নারী চরিত্র থাকবে নাটকে। যাকে নাটকে দেখা যাবে না। আর বজ্রা কোনো পুরুষ হবে যার সংলাপ দিয়ে নাটক শুরু হবে। সেই সঙ্গে পুরুষের সংলাপটি শুনিয়ে দিয়েছেন সেখানে নাট্যকার। তারা নাট্যকারের চরিত্রের সংলাপ শুনে মেনে নেয়নি কারণ সেই সংলাপে ছিল ‘চোরাবালির মতো সেক্স’। তারপর আবার একটু পরিবর্তন করে বলেছেন। সেটাও মানতে নারাজ। সেখানেও সেক্স এর কথা ছিল তাই। নাট্যকার রেগে গিয়ে বলছেন প্রভঞ্জনকে আপনি চলে যেতে পারেন। প্রভঞ্জন চায় না সে নাট্যকারের হাতের পুতুল হয়ে থাকুক। নাটকের যে বিষয়ে তাঁর নতুন নাটকটি লিখতে চান সেটি হল কোনো পুরুষ আজন্ম এক নারীর জন্য অপেক্ষায় থেকে থেকে স্থবির হয়ে পড়েছে। তার শক্তি ও স্মৃতি সব গেছে। তাদের সকলের অভিযোগ অনুযোগ আপেক্ষ প্রকাশ পেল। এর মূলে ছিল নাট্যকার স্বয়ং নিজে অভিনয় করছে তাই। সবাই চলে যায় তার পর নাট্যকার এবার নিজে আক্ষেপ করে বলেছেন—

“লেখা আমাকে দিয়ে আর হবে না— কলম ধরলেই বৃষ্টির মতো ঝেঁপে আসে অনেক স্মৃতি, অনেক অনুভূতি, যন্ত্রণা। গল্পের কুরুশ কাটায় তাদের বোনা যায় না।”^৯

অনেকদিন থেকে লেখা আসছে না। তাই নাট্যকার নিজেই চিন্তিত। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটি অশরীরী স্বর শুনতে পেলেন নাট্যকার। সেই চরিত্রের অংশ হতে চান তিনি। এই চরিত্রে পাঠ করে তিনি জ্যান্ত হতে চান। এতটুকু ইচ্ছে শুধু তার। তার সঙ্গে সেই রমনীকেও তিনি চান নাট্যকার নিজেই বললেন সে সেই রমণী ছিলেন না। তবে সেই

রমণী মা, কন্যা জায়া প্রণয়িনী সব হতে পারেন যার সঙ্গে তিনি হয়তো একসময় বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব কাটিয়েছেন। সে রমণী বলেছেন নাট্যকারের পঞ্চাশ হলে সে ফিরে আসবে সেই রমণীর অপেক্ষায় সে রয়েছে। একটু পরে দেখা গিয়েছে সেই রমণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে। তিনি এসে জানিয়েছেন মানুষের মধ্যে যে ‘স্বয়ং’ আর ‘অহং’ বোধ রয়েছে সেই বোধকে দূর করতে। সেই বোধ দূর হলে মানুষ হয়ে উঠে স্পষ্ট, চঞ্চল ও প্রাণবন্ত। নাট্যকার জানান সেটা তো সম্ভব নয়, কারণ সেই ‘ডোরাকাটা ফতুয়া আর নীল হাফ প্যান্টটা’কে খুঁজে বের করা যাবে না। সেখানে সেই পুরুষ চরিত্রটি এসে জানায় তুমি পারবে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো। এই ‘বর্তমানের হাড়িকাঠ’ থেকে সরে এসে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। নাট্যকার যেতে রাজি হলেন। সেই সকালে ফিরে যেতে। এবার সেই পুরুষ চরিত্রের কাঁধে ভর করে এগিয়ে চলেছে দু’জনে। এই ভাবে উপন্যাসের কাহিনির গতি এগিয়ে গিয়েছে। প্রথমে শৈশবে ফিরে গেলেন নারী বলতে শুধু মা যেখানে ছিলেন। সেই গ্রামের নদীর ধার। রাতে ইস্টিমারের সিটির শব্দ, গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর যাওয়ার পথ, নিশির ডাক শোনা, নদীর ধারের বালিতে তরমুজ খেতে যাওয়া সব স্মৃতি মনে করছেন। সমালোচক যথার্থই জানিয়েছেন—

“শৈশব থেকে ওঠে একটি মানুষ। স্মৃতির সরণি বেয়ে তার মুগ্ধ কৈশোরে ফিরে যাওয়া, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন: এই জীবন-কাহিনি সন্তোষকুমারের মুখ্য কাহিনি।”^{১০}

পুরুষ সত্তাটি এসে আবার যুক্ত করছেন কাশ ফুলের কথা, জন্মদিনের মায়ের হাতের পায়েস। বাড়ির পাশের কলমি শাকের পুকুর, ইত্যাদি বিষয়গুলি। এখানে সঙ্গ দিয়েছেন সেই রমণীও। নাট্যকারের মনে পড়েছে সেই ছোট বেলায় রোজ সূর্যোদয় দেখতেন। কলকাতার শহরে আর হয়ে উঠে না। এর জন্য দায়ি বলেছেন নাট্যকার বয়স। চাঁদ দেখাও ভুলে গিয়েছে। সেই চেনা চাঁদ আগের মতো নেই। একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন—

“ফুলশয্যায় ছেনে ছেনে যেমন একটি নারী-শরীর আমরা যে-ই পাই, অমনিই প্রিয়াকে হারাই।”^{১১}

এরপর নাট্যকারে ভূমিকম্পের কথা মনে পড়ে। মাসতুতো দিদি ও জামাইবাবু তখন তাদের বাড়িতে এসেছিল। সেই দিন রাতে হয়েছে ভূমিকম্প। তার ফলে ‘বড় ঘরের টিনের চাল নৌকোর’ মতো দুলেছিল। নাট্যকারের সেই সময় ঘুম পেয়েছে। জামাইবাবুর ভূমিকম্প বিষয়ে যুক্তি সংগত কথা কেউ শুনেনি। সেই দিনের অসংলগ্ন বেশ কয়েকটি দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন নাট্যকার। তার পর শুরু হয় দুই পরিচ্ছেদ। সেই পুরুষের সংলাপ দিয়ে শুরু। নাট্যকারের শৈশবের বর্ণনা শুনে সেই পুরুষও পৌছে গেলেন শৈশবে। প্রতিটি মাসের আলাদা আলাদা অর্থ বের করত ভাবের কল্লনায়। তার মনে পড়েছে রেল-কলোনির কোয়ার্টারে আগুন লাগার কথা সেই আগুনে রেণুরা ঘর ছাড়া হয়েছে। রেণু ছিল তার দিদির বন্ধু। রেণুদের পারিবারিক বর্ণনা থেকে জানা গিয়েছে তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। রেণুর বাবা ভাং খেয়ে ঘুরত, রেণুর পরনে ছিল ছেঁড়া ফ্রক। নাট্যকার এই রেণু চরিত্রকে নোট করে নিলেন। তাঁর পরবর্তী নাটকের চরিত্রে কাজে লাগাবেন। নাট্যকার আমাদের নিয়ে গেলেন শৈশবের সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে। যেমন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— দুপুরে জামগাছতলায় শীতলপাটি নিয়ে লুডো খেলা, কড়ি খেলা, তেঁতুলবিচি খেলা, এতুল-বেতুল খেলা, ইত্যাদি। পুরো গ্রাম বাংলার ছবি উঠে এসেছে। করমচা ছেঁড়া, কামরাঙা পাড়া, সেই হরতুকি গাছের ডালে ঘুঘুর ডাক শোনা ইত্যাদি অতি পরিচিত গ্রাম-বাংলার দৃশ্য। একটু পরে দেখা গেল সেই রমণীর প্রবেশ যে পরিণত যৌবনকে রেখে কিশোরী রূপে দেখা দিলেন। বদলে ফেলেছেন তার সাজপোশাকও পরনে ফিকে হলদে ডুরে শাড়ি, কপালে কাচপোকাকার টিপ, খালি পায়ে আলদা এই সাজ দেখে নাট্যকারের সেকালের ফেলে আসা পুঁটু, বুঁচি, আল্লাদের কথা মনে পড়ল। সেই রমণী থাকো চরিত্র হয়ে এসেছে। সেই দুপুর ঝড়ে থাকো পালিয়ে গিয়েছে ঘরে, ঝড় কমার পর এসেছে শিল পড়ার সময় আম তুলতে। নাট্যকাররা অনেকে মিলে একটি গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়েছেন। তাদের সকলের গায়ে পিঁপড়ে কামড়ে ছিল সেই সময় আড়ালে গিয়ে নাট্যকারের প্রথম ন্যাংটো হওয়া। তারপর ঝড় কমার পর তারা জাম, আম কুড়িয়েছিল। থাকো এসেছে পেয়ারায় দাঁত বসাতে বসাতে ঝড় থামার পর আর সঙ্গে ছিল তার মাসতুতো ভাই নিত্য। নিত্য ছিল জেলার স্কুলের ছাত্র, গরমের ছুটিতে থাকোদের বাড়িতে এসেছে। থাকোকে নাট্যকার প্রশ্ন করে কোথায় ছিল এতসময় ধরে। থাকো যে সাজ ছিল সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে মনে মনে রাগ করেন নাট্যকার। রাগের কারণ নিত্য পাশে কেন। আরো একটা বিষয়ে রাগ হয়েছে কাজল থাকোর পুরো চোখে লেপটে গিয়েছে বলে। নাট্যকার বললেন- ‘আমি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম?’ ওই বয়সে প্রতিহিংসার পিছনে

কি যুক্তি ছিল নাট্যকার তা জানেন না। আর সেদিন একা একা খুব কেঁদেছিলেন নাট্যকার। এই পুরোনো কথা আর স্মরণ করতে চান না নাট্যকার কারণ এখন কোঠাবাড়িতে থাকেন আগে ছিলেন টিনের একটা দোচালা ঘর আর তিনটে খড়ের ঘর। সেই ঝড়ের কথা পড়লে শরীর শুধু থরথর করে কেঁপে উঠে। সেকালের ঝড় এলে মা ‘পবন-ঠাকুর বসো বসো’ মন্ত্র পড়তেন। মায়ের কথাও মনে পড়ে গেল নাট্যকারের থাকোর কথার পাশাপাশি। এতক্ষণ যে পুরুষ সত্তা হয়ে কথা বলেছিল নাট্যকারের সঙ্গে সেই পুরুষ নাট্যকার নিজেই। থাকো আবার সেই পরিণত রমণীতে রূপান্তরিত হল। নাট্যকার স্থায়ী মান সম্মান ধন-সম্পদ নিয়ে সেই ফেলে আসা দুঃখকে আবার মনে করছেন। সেকালে নাট্যকারের বাবা কলকাতার মনু থিয়েটারে কাজ করতেন। বাবা টাকা পাঠালে তারা রহিম ঘরামিকে ঘর ছাওয়ার টাকা দিতে পারবেন এতটাই অনিশ্চিত জীবন-যাপন করতেন তারা। সেই সময়ে বন্যার কথাও মনে পড়ে। তাদের বাড়ির উঠোনে জল জমেছে। রোগা গুঁটিকি থাকোকে মনে হয় ভরা শরীরের নারী। ইটখোলার ইসুফ মিস্ত্রির সঙ্গে দামে বনেনি বলেই তারা ইট দিয়ে দাওয়া তৈরি করতে পারেনি। নাট্যকার সাঁতার জানতেন না থাকো কিন্তু কসলি বুকে চেপে নদীতে নেমে যেত। তারা ব্যঙ্গ করে দু’টো ঝুনো নারকেল বেঁধে থাকোরা নামতে বলত। নাট্যকার শুধু পারে বসেই তাদের জলে নামার দৃশ্য দেখতেন। কী কী দেখলেন— হাঁস তাড়ানো, কাপড় জল পেয়ে ফুলে ওঠা, স্বচ্ছ জলে তাদের হাত পা দেখতে পেলেন। নামার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই গায়ে জ্বর ছিল। বর্ষাকাল হলেই তার জ্বর আসত। আর ছিল পেটের অসুখ, নাট্যকার মনে করেন অনেকদিন থেকে জ্বর হয় না পেটের গোলমাল হয় না ক্যান্সার আর লিউকোমিয়ার মতো রোগের আশঙ্কায় আছেন। এই নতুন রোগগুলি যখন তখন হয়ে যেতে পারে। সেদিন রাতে নাট্যকারের মা রুটি করেছেন। তার জ্বরের শরীর তাই। মা রান্না করার সময় একটি সাপ ব্যাঙ ধরেছে, ব্যাঙটার কান্না তাদের পিছনের ঝোঁপ থেকেই এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতা নাট্যকারের আগেও হয়েছে। নাট্যকারের আর একটি বিষয়ে ভয় ছিল তা হল সর্পভয়। এই ভাবে কিছু সময় স্মৃতিচারণ করার পর দেখা গিয়েছে আবার সেই পুরুষ সত্তাটির প্রতিফলন। সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে—

“আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে যে ধরনের চরিত্র স্থান পায় তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিকাশক্ষম অস্থিরতা ও একাধিক বৃত্তির সংঘাত তীব্রতা।”^{২২}

পুরুষসত্তা সেকালের রথের মেলার যেতে চান। সেই দৃশ্য বড় মুগ্ধকর। কদমা কেনা, বাতাসা খাওয়া, তালপাতার বাঁশি কেনা ইত্যাদি। পরে নাট্যকার সেই কলাগাছের গুঁড়ির ভেলায় চলা, কলমিদাম, কচুরিপানায় পাশ কেটে এগিয়ে চলা তারপর হাটের গঞ্জ, নয়ানজুলি, শ্মশানে পৌঁছে যাওয়া সেই পথ ধরেই। শ্মশান ভালো লাগত। ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’ কবিতার মতো কবিকে যেমন ওই চিতা কাঠ ডাকত, এখানে নাট্যকারকে ডাকত ভাঙা কলসি, অঙ্গরের মলিন চিতাচিহ্ন, ভালো লাগত শ্মশানের সেই বটগাছ। সে সময় মৃত্যু কী সে বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না অথচ ভালো লাগত সেই জায়গাগুলো। এইটুকুই ধারণা ছিল যেমন একটু উদাস হওয়া, একটু ব্যথা পাওয়া, একটু বিষণ্ণ বোধ করা ইত্যাদি। সেই রেলের লাশকাটা ঘর থেকে পুরোপুরি আলাদা ধারণা ছিল। তবে তার মনে আছে সেই মড়াকাটা ঘরের পাশে একজন ফকির থাকতেন। সেই ফকির ছিলেন হিন্দি ভাষী। তার ছিল একটা ঝুলি। সেই ঝুলি দেখে একজন বালকের যা যা কল্পনা আসে সবগুলোই তার মধ্যে এসেছে। শহরে তিনি যেতেন না কারণ শহরের কুকুরগুলো তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করত। অনেক সময় বালকদের হাতে ঢিলও খেতেন ফকির। ফকির রেগে এগিয়ে যাওয়ায় ছেলেগুলো তাকে মেরেছে। সেই সময় তার মুখ থেকে ‘বিসমিল্লা রহমান রহিম’ আর ‘লা-ইলাহে-ইল্লালাহ’ শব্দগুলি ভেসে এসেছে। এই দৃশ্যটি নাট্যকারের চোখে ভাসে। সেই ফকিরের কাজ থেকে নাট্যকার সুতো আর প্রবাল-পাথর নিয়েছেন। সেই ফকির নাট্যকারকে বলেছেন চার পরিচর সঙ্গী তার বিয়ে হবে। এই কথা শুনে নাট্যকারের একটি মুখ ভেসে আসত নাকছাবি, নোলক পরা, দীঘল ঘোমটার পাশে কালো চোখ, আলতাপরা পা ইত্যাদি যা এক কথায় বলা যেতে পারে নাট্যকারের মায়ের ছিপছিপে সংস্করণ। অনেক পরে মা-মাসিমা বউ নিয়ে খ্যাপাতেন। মায়ের কথা থেকে জানা গিয়েছে নাট্যকার (অপু)কে এক মাস্টারমশায়ের তিন বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তখন অপু বয়স ছিল চার বছর। সাতদিনের জ্বরে মেয়েটি মারা গিয়েছে। এর পর আমরা পরবর্তী অংশে অপু নাম নিয়েই এগিয়ে যাব। তারপর স্মৃতিতে আসে পুজোর সেই দিনের কথা। কোজাগরী লক্ষ্মীর পর সেই চিড়ের মোয়া, তিলের নাড়ু কথা, তারপর বড়দিনের কথা, যেখানে ভাঙা বাংলায় পাদরি হোয়াইট সাহেবের

উচ্চারণ। সরস্বতী পূজায় চাঁদা দিয়েছেন, মণিদির বিয়েতে তিনি এসেছেন। তারপর সন্ধ্যার ম্যাজিক লন্ঠন দেখতে যাওয়া। লেখক ছোট ছোট জলছবি আঁকছেন চরিত্রের শৈশবের দিনগুলি নিয়ে এসে। নাট্যকার মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেন সেই ছুটে চলা রেলগাড়িকে যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলছে। এই ছুটে চলা আসলে ব্যস্ত জীবনের প্রতিক্রিয়া হয়ে যেন দেখা দিয়েছে।

তারপর শুরু হয় তৃতীয় পরিচ্ছেদ যেখানে নাট্যকার কিশোর চরিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। সে সময় তার মনে পড়ে শীতকালে পাড়ায় বহরুপী আসে সেই মুখে বিভিন্ন রঙ মাখিয়ে। কিশোরের মুখে একটি দাগ ছিল ক্ষুর লেগে কেটে গেছে। আগে যে আমরা রেণু চরিত্র পেয়েছি এখানে তার আবার আবির্ভাব ঘটে। অসিত নামে রেণুর ক্লাসের এক বন্ধুর কথা আসে। শীতকালে ভোরে নগর সংকীর্ণনের দল আসে। কিশোর বয়সে তার মনে হয়েছে কিশোরের কোনো পিছুটান নেই, কারণ সে একেবারে নতুন হয়ে যাচ্ছে। নাট্যকার সত্তা বলেছে এই বয়সে তার এই কথাগুলো বেমানান। কিশোরের রোজ তেপ্তা পেত আর জল পান করতে যেত রেণুদের বাড়ি। কিশোরের এক সহপাঠী বন্ধু ছিল নির্মল নামের। দু'জনে একসময় অনেকটা সময় কাটিয়ে বুঝেছে সুখের সম্বল তাদের দু'জনের মধ্যেই ছিল। তাই নির্মল একসময় কিশোরের হাতে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়েছিল। 'প্রিয়, প্রিয়তম' শব্দ বলে। সেই কিশোর বয়সে তারা এক অর্থে সমকামী। উপলব্ধি করতে পেরেছে মেয়েরা সেই সময় একটা শরীর ছাড়া কিছু নয়। নাট্যকার সত্তা বলে এসব কথা 'হাটে বাজারে' বলার ব্যাপার নয়। কিছু জানায় সবই বুঝি অথচ মনে হয় মনের মধ্যে অজান্তেই কান্না পেত এই কান্নার কারণ পরে জেনেছি সেখানে ছিল সুখ আর যন্ত্রণা মিশে। আর তাই সেই বয়সে নিজেকে নিংড়ে ফেলা, ক্ষরিত করা, বিষাদ আর গ্লানিতে ডুবিয়ে রাখা। তাই এই উপলব্ধি কিশোর নাট্যকারের সত্তাও মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল। শীতের সময় রাতে কিশোর যাত্রার দলে এসে বুঝতে পেরেছে তার জীবনের দু'টি অংশকে নিষ্কাম ও সন্ধ্যা। তার মনে পড়ল যাত্রার আসরে প্রচণ্ড শোরগোলের কথা। কারণ ছিল কোনো একটি লোক জাপটে ধরে চুমু খেয়েছে একটি মেয়েকে। সেই দৃশ্যের পর কিশোরের মনে এলো রেণুর কথা যে রেণু কিশোরের চেয়ে দু'বছরের বড় ছিল। সেই রমণী আবার রেণুতে রূপান্তরিত হয়ে এলো। ঘর পুড়ে যাওয়ার পর রেণু কলকাতায় গিয়েছিল সেখান থেকে 'জীবনের সব কিছু জেনে এসেছিল'। রেণু জানায় তাকে রোজ সাইকেলের পিঠে চাপিয়ে শিবাজীদা 'বায়োস্কোপ' দেখাতে নিয়ে যেত। কিশোর ধীরে ধীরে জৈবিক চাহিদার জন্য রেণুকে একদিন আড়াল থেকে দেখে তার মধ্যে যে মানসিক পরিবর্তন হয়েছে তার প্রতিফলন—

“আঃ, শরীর, নারী-শরীর। সেই আমি প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। বর্তুল, ঘটাকৃতি, ভঙ্গিম। অসহ্য একটা অনুভূতি আমাকে আক্রমণ করল, তার হাত থেকে নিস্তার পেতে আমি শিশ দিলাম। একটা দাঁতে ঠোঁটে চাপ দিয়ে আমি ক্ষত সৃষ্টি করলাম।”^{১৩}

তার পরে দেখা গিয়েছে সেই রেণুর জন্য চিঠি বয়ে এনেছে কিশোর সেই চিঠি ছিল অসিতের। সেদিন প্রথম রেণুর কাছে জেনেছিল ভাব হলে একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকে। তাই পরে চোদ্দ বছরের বেবির সঙ্গে তার ভাব হয়েছে সেই বেবিকে রেণুর বিছানার ওপর কাত করে ফেলে চুমু খেয়েছিল, সেদিন প্রথম ঠোঁটে জিভে লোনা স্বাদ লাগিয়েছিল। কিশোর উপলব্ধি করতে পেরেছে সে মনে মনে যাকে খুঁজছে তা আসলে নয়। তাই সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে—

“আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃতে উদাসী একাকী হয়েছি— একথা অস্বীকার করা যায় না।”^{১৪}

পরে দেখা যায় সেই বেবি এই ঘটনার দু'মাস পরে একটা অসুখে ভুগে মারা গিয়েছে। নাট্যকার বলেছিলেন আমার এই কিশোর সত্তা আমাকে নগ্ন করে তুলছে। এই কিশোর রূপান্তরিত হল যুবকে। নাট্যকারের সত্তা এবার যুবক সত্তা হয়ে কথা বলবে তার সঙ্গে। নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন ভাল না বেসেও অনেক নারীকে কাছে ডেকেছেন তিনি। যেমন, ছোটমাসির নন্দ সোনালিকে ডেকেছেন। সে রুমালে ফুল তুলে দিয়েছিল। সেই রুমার দেখে ফেলেন মেশোমশাই তোশক রোদে দিতে গিয়ে। মেসো আবিষ্কার করলেন তাদের ভালোবাসার কথা। পরে নাট্যকার স্বীকার করেন শুধু নিজেই মেয়েকে ঠকাননি, নিজেও ঠকেছেন। অনেক পরে এসে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। রেণুকে বলেন—

“তবু জেনে রেখো, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও আমি সামনে ছুটিছি—মৃত্যুর দিকে। ...নকশাখানি আছে ঈশ্বরের হাতে। মৃত্যু, পুনর্জন্ম, আবার মৃত্যু। নতুন মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবার আগে একবার পুরাতন মৃত্যুর কাছাকাছি কিছুক্ষণ থাকতে দাও—আমার ক্ষতবিক্ষত প্রথম জীবনে।”^{১৫}

তারপর শুরু হয় চার পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদে এসে কিশোর উপলব্ধি করতে পারল এই পৃথিবীতে ‘সবাই বদলায়, সবই বদলায়’। কিশোর ধীরে ধীরে বড় হয়েছে শারীরিক ভাবেও। কিশোর উপলব্ধি করতে পেরেছে ছেলের বড় হওয়া মায়েরা নাকি সহ্য করতে পারে না। আস্তে আস্তে মায়েরা সহ্য করে নেন শিশিরের মা, পরে কিশোরের মাও নিয়েছিলেন। গলার স্বর পরিবর্তন হয়েছে আগের চেয়ে ভারী আর ভাঙা। মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারে, মানুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে। তার জীবনে প্রভাব ফেলেছিল অপেরা পার্টির বড় অ্যাকটর সূর্য সমাদ্দার। প্রথম দিন ডেকে বলেছেন কেঁচোর মতো হাঁটবি না পুরুষের মতো হাঁটবি। আমার এখানে বেশি আসবি না এলে বদনাম হয়। কিশোরকে বলেন তোরও হবে বেশি এলে। সেই সূর্য সমাদ্দারের কথা বলার ধরন কিশোর আয়নায় নকল করত। সমালোচক বীরেন্দ্র দত্তের পর্যালোচনায় বলা যেতে পারে—

“বুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোক আর হৃদয়বৃত্তির জটিল অঙ্ককার মধ্যবর্তী যে অস্থির অঞ্চল, তাকে সন্তোষকুমার ঘোষ আলোকিত করেন বুদ্ধির দ্যুতিতেই।”^{১৬}

এর আগে কিশোর মাত্র দু’বার কলকাতায় গিয়েছিল। প্রথম বার বাবার সঙ্গে গিয়ে ‘জয়দেব’ মুন থিয়েটারে দেখেছে, আর কার্নিভাল দেখেছিল কলকাতার মাঠে। সেখানে মিনিদের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে মিনিদের সৎ মাকে দেখেছিল, মিনির সঙ্গে বনিবনা ছিল না। মিনির বিয়ে হয়ে বিধবা হয়ে আবার ঘরে ফিরে আসে। পরে মনিকে বাড়ি থেকে চালাত করে দিলো রাজশাহি বা নাটোর নামের কোনো একটা জায়গায়। মিনি সেখানে হাতের কাজ করে। যেমন, চামড়ার কাজ, বেতের কাজ, কার্পেটের ইত্যাদি। অনেক দিন পর ফিরে এসে দেখা গিয়েছে মিনিদি থানের পরিবর্তে কালোপাড়া ধুতি আর সেমিজ পরত। বয়স তখন আনুমানিক চল্লিশ বছর। চুল রেখে দিয়েছে সেকালে বিধবাদের কাছে এটা দুঃসাহসিকতা। মনিকে তেজি মেয়ে হয়ে ফিরে আসতে দেখেছে কিশোর। কিশোর পরে ভেবেছে এই গ্রাম থেকে যারা যায় অনেকটা পরিবর্তন হয়ে ফিরে আসে এর কারণ খুঁজেছে জলহাওয়া, সময় কিংবা বয়স হতে পারে। সেই রমণী আবার এল নরুন ধুতি পরে মিনিদি হয়ে। কিশোর প্রথম যখন মিনিদিকে দেখে তার চোখগুলো ভাল লেগেছে এত কালো। সেই মিনিদি কিশোরের কাছে ব্রাইটাইআই সুতো এনে দিতে বলেছিল বাজার থেকে। মিনিদি ফিরে এসে মাসে তার জন্য দশ টাকার মনিঅর্ডার আসত। মাঝে মাঝে মিনিদিকে কিশোর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে মনে মনে ভাবে মিনিদি কী নিজের ভিতর দেখেছে। একদিন কিশোর মিনিদির ব্যাগে আবিষ্কার করল স্বদেশমূলক অনেক বই যেমন, পথের দাবি, গীতা, আনন্দমঠ’ সঙ্ঘিতা, চয়নিকা প্রভৃতি। সেই স্বদেশি নিয়ে কথা বলতে মিনিদির বিধবা চেহারা সধবার মতো মনে হয়েছে। পরে মিনিদি নিজেই কিশোরকে কিছু বই দিয়েছিল যেগুলো বেশিরভাগ বাজেয়াপ্ত করা ছিল। সেই বইগুলো পড়ে পড়ে কিশোর ছনের চালে গুঁজে রাখত। পিস্তল রাখার মতো সতর্কতা করে। একদিন সেই নতুন আগন্তকের সঙ্গে কিশোরের দেখা হল। মিনিদি যার সঙ্গে একদিন দেখা করতে চেয়েছিল। সেই আগন্তক আসল নাম গোপন রেখেছে। কখনো বলেছে জীবানন্দ আবার কখনও সব্যসাচী। কিশোর দলে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলে সেই আগন্তক জানান আগে তৈরি হও তার পর দলের লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমাকে শক্ত ধাতুতে তৈরি থাকতে হবে। সেই সব ভেবে কিশোর কল্পনার জগতে অনেক কিছু ভেবে নেয়। মাঝে মাঝে সেই আগন্তক কিশোরকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। সেই আগন্তক কিশোরকে বলেন ‘প্রজ্বলন্ত উলকাপিণ্ড’ হতে। এই ঘটনার কিছু সময় পরে কিশোর শুনতে পায় মিনি আর আগন্তকের মধ্যে কথোপকথন। মিনির কণ্ঠে শুনতে পেয়েছে—

“দ্যাখো জীবনে কিছু তো পাইনি। মায়ের বদলে সৎমা, বিয়ে হতে-না-হতেই শুনলাম আমি বিধবা। সব তো শেষ হয়েই গিয়েছিল, হতে চলেছিল, তখন ভাগ্যে তুমি এলে। পথ দেখালে।”^{১৭}

মিনির স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন হলে সেই আগন্তকে বিয়ে করে নিবে। সেই আগন্তক মিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কিশোরের উপলব্ধিতে যা ধরা পড়েছে—

“মিনিদি হাঁপাবে কেন, হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে কেন যে, ‘ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, কেউ এসে পড়বে, দু’দিকেরই দরজা খোলা, কেউ দেখে ফেলবে। ‘মনে হল মিনিদি কাঁদছে। — এখন তো এসব চাইনি আমি। দেশ স্বাধীন হলে আমরা বিয়ে করব, তোমার কাছে মাত্র এইটুকু তো চেয়েছি।”^{১৮}

পরে পারিবারিক অশান্তি হয় মিনির বাবা উকিল নৃপেন কোনো মতেই তাকে বাড়িতে রাখতে রাজি নয়। সৎ মা সেই আগন্তকের কাছে আগেই কুড়ি টাকা নিয়েছে। প্রথমে যে স্বদেশ বা দেশ নায়কের কথ বলেছে সেই আগন্তকের চরিত্রে পরে তা দেখা যায়নি। পাড়ায় লোকের মুখে অববাদ শুনতে হয়েছে মেয়ের জন্য। তাই সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে— “নারীকে এই অপমান ও গ্লানির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে স্বাবলম্বী হতে হবে।”^{১৯} শুনটু বেড়ার ফাঁক দিয়ে যা দেখেছিল এসে মিনির সৎ মাকে বলে দিয়েছে। রেগে গিয়ে বাবা মেয়েকে রক্ষিতা বলেন, আরো বলেন—

“বলব একশোবার। নষ্ট মেয়ে, ভ্রষ্ট মেয়ে, আমি তোর বাবা না। পাড়ায় কান পাতা যায় না, মুখ দেখাতে পারব না—।”^{২০}

এই দৃশ্য দেখে কিশোর অব্যক্ত একটা আত্ননাদ বুকে চেপে বাড়ি ফিরে আসে। পরের দিন কিশোর গিয়ে দেখল পুরো আলাদা দৃশ্য সবাই চুপচাপ। নৃপেন কাকু উকিলের জ্বর, সৎ মা নিজের কাজে ব্যস্ত মিনিদির ভাইরা নিজেরা ‘ডাংগুলি’ খেলা নিয়ে ব্যস্ত। সেই বাড়ি থেকে আগন্তক পালিয়ে গিয়েছে মিনিদি নিয়ে। এর পরে কিশোরের মনে আসে শরদিন্দুবাবুর কথা, সৌম্য কান্তি দেহ ছিল আর কণ্ঠছিল শঙ্খের মতো। বক্তৃতা মঞ্চে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। সেই শরদিন্দুবাবুর অসুস্থ হওয়ার দৃশ্যটি কিশোরের মনে পড়েছে। তিরিশ দশকের সেই সব দিনের কথা কিশোর মনে করল। পরে কিশোর উপলব্ধি করতে পেরেছে বয়স হলে আমরা নিজের সুবিধাভে সমাজের নিরাপদ জায়গা খুঁজি, নতুন কিছু এলে ভাল আমরা জানি স্বীকার করেও নিজের ব্যক্তিগত সংশয়কে সমাজের চোখে বুঝতে দিই না। তখন বুঝতে পারি নিজে কতটা অসৎ। মনের সঙ্গে এই বোঝাপড়া বড় ভয়ের। এই সংশয় তখন দূর হবে যখন বিশ্বাসের সঙ্গে পালটা বিশ্বাস দিয়ে মোকাবিলা করব। অবিশ্বাস ঢুকলে আসি সংশয় আসে পরাজয় ও ব্যর্থতার জ্বালা। শরদিন্দুর পরিবারটি পুরো মনে আছে কিশোরের তার স্ত্রী, তার মেয়ে রীতা, শরদিন্দুর সহকর্মী প্রাণ শিকদারের কথাও। প্রাণ শিকদার বড় ঘরের ছেলে ছিল শরদিন্দুর ডাকে সে সত্যগ্রহে নেমেছে। সমাজে প্রচলিত সেই প্রাণ শিকদারের সঙ্গে রীতা প্রায় ঘুরে। তার মা চরকা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, অন্যদিকে শরদিন্দু প্রায় জেলে থাকেন। সেই সুবাদের রীতা আর প্রাণের সম্পর্ক আরো গভীরে গিয়েছে। যেমন, একসঙ্গে ঈশানপুরের মেলায় যাওয়া, টকি দেখা। পরে তারা জানতে পারে প্রাণ শিকদার গুপ্তচরের কাজ করেছে। নীতিভূষণ এটা আবিষ্কার করেছে প্রাণ স্পাই। সেই খবর পেয়ে ছেলেদের কাছে প্রাণ হয়ে উঠল ইতর ও পশুর সমতুল্য। তার পর আরো নতুন তথ্য তারা পেয়েছে রীতার আগে যে ফিটের রোগ ছিল সেটা আর নেই এখন রীতার তার পরিবর্তে নতুন রোগ দেখা যায় বমি। রীতার এই অবস্থা দেখে প্রাণকে মারা জন্য পরিকল্পনা করা হয় এই পরিকল্পনায় সারা দেয়নি সিতু আর সুধাংশু নামের দুই ছেলে। পরে পরিকল্পনা করে বাড়িতে গিয়ে শরদিন্দুকে এই ঘটনা জানাবে। তার ঘরে গিয়ে দেখে শরদিন্দুর মাথার ছিটের লক্ষণ তারা দেখতে পেরেছে। তবুও সাহস নিয়ে কিশোর আর রতন ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করে। পরে শরদিন্দুর কাছে সমস্ত কিছু বলতে যাবে এমন সময় রীতা নিজেই বাইরে বেড়িয়ে এসেছে। মেয়ের অসুস্থতার কথা শরদিন্দু নিজেই শুরু করেন। তিনি জানান মেয়ের সর্দিকাশি, হজমের গোলমাল আছে। রতন আর কিশোর তো বলেই দিয়েছে তার সঙ্গে কী বমিও করে। এই কথা শেষ হতে না হতেই রীতা এসে হাজির। এই রকম হবে রতন কিশোর প্রস্তুত ছিল না। রীতা তাদের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে পালানোর ফাঁকে ফাঁকে তারা বলেছে প্রাণ একটা বদমাশ, চোর, লম্পট, আপনার মেয়ের সর্বনাশ করেছে। এর পর যখন শুনলেন স্পাই-এর কথা তখন শরদিন্দু একটু নড়ে চড়ে বসলেন। সবশেষে বলে নীতিভূষণকে প্রাণই ধরে দিয়েছে। এই কথা শোনে শরদিন্দু পড়ে যান, পরে মানসিক রোগের চিকিৎসায় ছিলেন এই পর্যন্ত কিশোরের মনে পড়েছে। কিশোর এই অভিযোগ করতে গিয়েছে ঈর্ষার কারণে, এই বিষয়টা কিশোর পরে স্বীকার করেছে। আর শরদিন্দু যে চুপ করে বসে ছিলেন তা আসলে শূন্যতা বোধের কারণে। সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে—

“এমনও বলা যেতে পারে, অনেক তো হল, এবার মরণের পাশে শুতে চাই।”^{২১}

কিশোর নিজেই তা বুঝতে পারে এক সময়। বিশ্ব নামে এক ছেলে ছিল। তার লেখা কিশোরের ভাল লেগেছে। কিশোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সামনে কলকাতায় যাওয়ার জন্য। প্রতিবেশি চলনদার ভূপেনমামা এলেই কিশোরের মা-কে খবর দিবেন। বীরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। এই বীরেশবাবু ছিলেন কিশোরের পিতা। ভূপেনবাবু সম্পর্কে বলা যেতে পারে তিনি শিলাইদার কাছারিতে কাজ করতেন। সেখান থেকে রবিবাবুর জমিদারী কাছেই ছিল। তিনি সর্বদা গান গাইতেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সংগীত। কিশোর ও তার মা কলকাতা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। মায়ের একটা ফোটো আর কিছু জামাকাপড়। মা সঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও মায়ের একটা ছবি নিয়ে যাওয়ার কারণ মায়ের ছিল তরুণী বয়সের ছবি। কিশোর নাট্যকারকে জানায় এই বয়সে দাঁড়িয়ে একটাই ছবি ভেসে উঠে শুধু মায়ের মুখ। এর পর পাঁচ পরিচ্ছেদ শুরু হয়। এই পরিচ্ছেদের ঘটনা শহর কলকাতাকে নিয়ে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সত্তা বলে উঠে খুব সাবধান সংলাপ খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করবে। মুখোশ পরে থাকো। পুরুষ চরিত্রের আবির্ভাব হল কারণ কিশোর যেখানে সংকোচ বোধ করবে, লজ্জা পাবে, বিবেকহীনতায় ভূগবে সেখানেই এই পুরুষ সত্তাটি তুলে ধরবে তাকে। কারণ আমরা একজন মানুষ দিনে অসংখ্যবার আলাদা মানুষ হয়ে যাই। তাই পুরুষ সত্তা জানায়—

“নিজেকে সর্বাংশে ভালমানুষ বলে জাহির করার চাল বই কিছু না। আত্মগোপনের চালাকি।”^{২২}

আগের আন্তিক কিশোর শহর কলকাতায় এসে নাস্তিক কিশোরে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। এর পিছনে তার মন মানসিকতায় কাজ করত যদি বন্ধুরা টের পায় যে সে যদি ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করে তবে সে ‘গাঁইয়া’। সমালোচকের ভাষায় বলা যেতে পারে— “সমকালীন কলকাতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্য”^{২৩} যেন এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই শহুরেপনা নকল করতে গিয়ে তাকে অনেক নাকাল হতে হয়েছে। পুরুষ সত্তাটি বলেছে—

“আমাদের নতুন হতে নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু পুরনোকে পুরোপুরি অস্বীকার করা পাপ। সেই পাপের জ্বালায় এতদিন পরে জ্বলছ।”^{২৪}

সেই সঙ্গে এই কথাটিও মনে করে দেয় পুরুষসত্তাটি। কিশোর যে সব মনের দুর্বলতা ঢাকতে চেয়েছে সেই সব বিষয়গুলি পুরুষ চরিত্রটি তুলে ধরেছিল। এক, তার সংসারের অভাব ও দারিদ্র্য বোধকে। দুই, কিশোরের গ্রাম্যতা, উচ্চারণ-দোষকে ঢাকতে। যেমন, দেবদাসকে দেবোদাস বলা, ভাগ্যচক্রকে ভাইগ্যাচক্র বলা। কিশোররা কলকাতায় বার টাকার ঘরে থাকত। একতলা ঘরের দিদি ন’টাকা ভাড়া দিয়ে থাকত। ছেলে নেই একটা বেড়াল আর একটা কুকুর ছিল। কিশোর বন্ধুদের শোনাতে সে ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। সে সময় ফ্ল্যাট বাড়ি বলা মানে নিজেদের কুলীন কুলীন মনে করা। তার ক্লাসের বন্ধুরা ছিল বটু, কমলেশ। কমলেশ ছিল খুব সরল প্রকৃতির ছেলে। মন্টু, প্রভুতি। কিশোর এক বাঁশি বাজানো আর্টিস্টকে ভালো লাগত সেই আর্টিস্টকে তার মনে হয়েছে জহর গাঙ্গুলি। পড়ে দেখা যায় সেই বাঁশির শব্দ শুনে সর্বাণী নামের এক মেয়ে জানালায় কান পেতে শুনত। কিশোর মাঝে মাঝে সাবান মাখার পর মনে করে নিজেকে ‘কস্তুরীমৃগ’ সেই সাবানের গন্ধ নিয়ে প্রেম নিবেদন করতে চায় মেয়েদের কাছে। এই কথায় যদিও কল্পনা মিশানো। সেকালে প্রেম করা সহজ ছিল না। কিশোর বাবা-মায়ের সেই মধ্যবিত্ত জীবনের সংসারকে দেখেছে। তাই বলা যেতে পারে—

“আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ পরিচয় আছে ‘স্বয়ং নায়ক’ উপন্যাসে।”^{২৫}

বাবাকে দেখেছে মায়ের হাতে একশো সতেরো টাকা তুলে দিতে। কিশোরের এক সময় নারীর প্রতি আসক্তি জন্মেছে বয়সের ধর্মই সেটা তো হবেই। পরে বুঝেছে সেই বাসনা, যাতনা, তৃষ্ণা, আসলে মেয়েদের শরীরের প্রতি আসক্তি হয়ে পড়া। তাই মাঝে মাঝে শান্ত চোখ মেলে নিঃশব্দে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার ঠিক কিছু দিন পরে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কালীদার আত্মীয় নাম আরতি। আরতি একজন শিক্ষিত নারী। বিবাহিত তবে অসুন্দর বলে তার স্বামী আরো অন্য জনকে বিয়ে করবে। এই কথা শুনে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সেই নারী একদিন রাতে চাঁদকে সাক্ষী রেখে কিশোরকে চুমু খেয়ে যায়। এই নারীকে কিশোর অনেক দিন মনে রেখেছে। যে সময় কিশোরের মনে ছিল নারীর শূন্যতা তাই।

তারপর ছয় নম্বর পরিচ্ছেদ শুরু হয়। নাট্যকার জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে আর খেই পাচ্ছে না। উপলব্ধি করতে পেরেছে সব পথ সরল ও বক্ররেখা। সময়ের নিরিখে। নাট্যকার উপলব্ধি করেন দিন দিন মৃত্যুর দিকে

এগিয়ে চলেছে। জীবনের পঞ্চাশে পৌঁছে একমাত্র ভরসা দর্শনের সাত্বনা। এই জেগে থাকা ইচ্ছে শুধু প্রিয়জনকে দেখার জন্য। আবার কল্পনায় ভর করে তরুণ বয়সে ফিরে যাওয়া। সিগারেট খাওয়ার সেই অভিজ্ঞতাকে মনে করা। সেই কত বছর কলকাতাতে থাকা সেই ঘোল আর কুড়ির কম্প দেওয়া জ্বর ফিরে আসে না। নাট্যকার স্বীকার করে নিয়েছেন—

“এই কলকাতার চেয়েও বাঘা বাঘা, সেরা সেরা কত শহর বন্দর দেখলাম, সেই কলকাতার মতো আর -একটাও না।”^{২৬}

এই কিশোর বয়সে ভাবনা ভাল লাগত যখন সেই ভাবনাগুলি তেতো লাগত তখন অস্থির হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া। কিশোরের আরও মনে পড়ে কলকাতায় আসার পথে তার মামাতো দাদা মারা গিয়েছে। মাঝে মাঝে সেই মুখটা কিশোরকে ভাবিত করে তুলে। তার পর জুঁই, সর্বাণীর কথা উঠে এসেছে মনের স্মৃতি কোণে। কিশোরের কাছে মেয়ে মানে একটু শিশির আর একটু জ্যোৎস্না। সর্বাণী ছিল মাসির বিয়ের পর মাসির সঙ্গেই এসেছে। মাসি, মেসোমশাই আর সর্বাণী এই তিনজন নিয়েই ওদের সংসার চলত। পরে সর্বাণী অসুখী অনুভব করে কারণ সে নিজে ত্রয়ীর মধ্যে জায়গা করে নিতে পারেনি তাই। সাত পরিচ্ছেদে এসে নাট্যকার নিজেই স্বগত সংলাপ করেছেন। তাঁর চোখে ছিল দর্শনের আতঙ্ক, দেহের ভঙ্গিতে ছিল শ্রান্তি ও অবসন্নতা। অতি পরিচিত জীবনের বিবাহ, সংসার, রোজকার কাজের ঘানি এসব নকল জীবন থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন জীবনে ফিরে আসতে চান নাট্যকার। এই প্রতিশ্রুতি রেখে তিনি ফিরে আসবেন সকলের মাঝে। শুধু সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। এখানেই উপন্যাসটি শেষ হয়।

উপসংহার : উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নাট্যকার তার নিজস্ব সত্তাকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে চারিত্রিক মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নাট্যকার পঞ্চাশের ঘরে পৌঁছে সেই অতীত জীবনে ফেলে আসা স্মৃতিতে ফিরে যেতে চেয়েছেন। দীর্ঘ এই জীবনের পথ চলার পর জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। প্রতিটি মানুষ সময়ের নিরিখে কী ভাবে ভেঙে নতুন মানুষ হয়ে উঠার চেষ্টা করে থাকেন সেই দিকটিও এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

Reference:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৫৭
২. গুপ্ত, ক্ষেত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রকাশ ভবন, কলকাতা কার্তিক ১৩৬৬, পৃ. ২১২
৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৬৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা, লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৮৩
৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬০০
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘চোখের বালি’ রবীন্দ্রচন্দাবলী (২য় খণ্ড), পৌষ ১৪০২ পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ভূমিকা অংশ,
৭. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬০১
৮. চক্রবর্তী শুভাশিস সন্তোষকুমার ঘোষ জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ কলকাতা : উড়োপত্র প্রথম প্রকাশ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ পৃ. ৭৪
৯. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬০৬
১০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঞ্চাশ বছর ১৯২৩-৭২, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৭৪, পৃ. ১৮৪
১১. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬০৮
১২. রায়, অলোক সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য; সাহিত্য লোক, কলকাতা : সংশোধিত মুদ্রণ : মার্চ ২০১৫ পৃ. ৬৫
১৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬১৮

-
১৪. দত্ত, সন্দীপ গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৪০০, পৃ. ২৮
১৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬২০
১৬. দত্ত বীরেন্দ্র কবি ও কথাকার পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯ পৃ. ৬৭
১৭. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬২৭
১৮. তদেব, পৃ. ৬২৮
১৯. মুখোপাধ্যায় এন 'বাংলা প্রবন্ধ পরিক্রমা' প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২১
২০. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬২৮
২১. মজুমদার, সমরেশ, সন্তোষকুমার ঘোষ শ্রীচরণে, সন্তোষকুমার ঘোষ, গল্প সমগ্র ১, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬ ভূমিকা অংশ
২২. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৮
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৬ পৃ. ৩৭২
২৪. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৯
২৫. মুখোপাধ্যায় তরুণ কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষ কলকাতা : কারুলিপি, প্রথম প্রকাশ ২৮ মার্চ ২০২১ পৃ. ১৪
২৬. ঘোষ, সন্তোষকুমার, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৯